OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 270 - 275
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

জয়া গোয়ালার ‘দেয়াল’ উপন্যাস : অন্তজ জীবনের প্রতিবেদন

দীপান্বিতা আচার্য
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: depanwitaacharjee@gmail.com
0009-0001-6544-9971

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Jaya Gowala, Tea garden, Inner class, Chilomilo language, Reminiscence, Self realization.

Abstract
Jaya Gowala is a renowned writer from Tripura. The background of most of her works is the tea gardens. She has written about the laughter and tears of these people, their lives and livelihoods. Being one of them, she has continuously brought their life stories into her writings. One such inner character is Ranjit in her novel 'Deyal'. How he sees his life through his inner world is the story of the novel. How he sees his life through his mental world is the story of the novel. The novel is written in the style of an autobiography. Ranjit Munda is the son of a tea garden. He goes to the city to study and writes poetry. Just as there is a son, a father, a friend, a husband, there is also an 'I' entity. How Ranjit Munda, who comes from the lower class, has tried to adapt and organize himself in the city, how he has become Ranjit Mandal from Ranjit Munda under the pressure of his wife without his knowledge, he himself does not understand. At the end of the novel, he starts burning in self-immolation. He wants to come out of the world made of steel. He again wants to go back to the garden with his parents, to his childhood. Where there is nothing but joy. How his life's pain has been highlighted through reminiscence and how he tried to get out of there will be discussed in this context.

Discussion

উপন্যাসে জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হয়। সময় ও পরিসর এই দুইয়ের মেলবন্ধন থেকেই তৈরি হয় উপন্যাসের প্রতিবেদন। প্লট, আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ, ঘটনাস্থল, সময় ও লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপন্যাস গঠিত। উপন্যাসের একটা নিজস্ব কাঠামো রয়েছে। ঔপন্যাসিক এখানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও ঘটনার ছবি আঁকেন। নানারকম উপাদানকে একত্র করে তিনি রচনা করেন উপন্যাসের। উপন্যাস জীবনের বা অভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক রূপ যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র কৌতূহল, কাকুতি ও সংগ্রাম উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। বিষয় আলোচনায় সময় ও পরিসর একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উপন্যাসে যে সময়কে নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই সময়ের যে চরিত্রগুলো থাকে তাদের নিয়েই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিষয় গড়ে উঠে। এই মানুষগুলো যে সময়ের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে তাই হল পরিসর। সময় ও পরিসরের সঠিক মেলবন্ধন হয়েছে কিনা তাই উপন্যাসের আলোচনায় তুলে ধরা হয়।

ত্রিপুরায় সাহিত্যের সম্ভার প্রচুর। সাহিত্যের জন্য বিষয়বস্তুর কোন অভাব নেই এই অঞ্চলে। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা সাহিত্যের সকল স্থানেই ত্রিপুরার বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। কি বাদ যায়নি সাহিত্যে, এখানের সাহিত্যে প্রকৃতি প্রেম ভালবাসা, পাহাড়ি অঞ্চল, সুর, ছন্দ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সন্ত্রাস, আদিবাসী জনজীবন কোন কিছুই বাদ যায়নি সাহিত্যিকের নজর এড়িয়ে। সকল বিষয়বস্তুই উঠে এসেছে বৈচিত্রময় সাহিত্য সম্ভারে। এমন বৈচিত্রময় সম্ভারের জন্য ত্রিপুরার সাহিত্য হয়ে উঠেছে অন্যোন্য সাধারণ। ত্রিপুরার সাহিত্য আলোচনায় ত্রিপুরার নারী লেখিকারা এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নারীদের এই লেখনী ধারণ। নারীদের অন্তপুরে যন্ত্রণার বিবরণ আমরা বিভিন্ন লেখায় শুনতে পাই। অসাম্যের এই লড়াইটা সহজ ছিল না। অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষদের সমস্যাবহুল জীবন, তাদের পীড়ন তাদের সংস্কার-সংস্কৃতির বাস্তব দলিল ত্রিপুরার উপন্যাস। বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জীবন কীভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার বাস্তবরূপ ফুটে উঠে ত্রিপুরার উপন্যাসে। ত্রিপুরার রাজনৈতিক সামাজিক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থানকে সূচিত করে তৈরি হয়েছে ত্রিপুরার উপন্যাস। ত্রিপুরায় নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যায় কম হলেও নির্বাচিত নারীদের উপন্যাসেও ত্রিপুরার যাবতীয় বিষয়বস্তু, ত্রিপুরার জনমানস সংস্কৃতি ইতিহাস তথা বর্তমানে বয়ে চলা সময়ের আখ্যানকে স্পর্শ করেই তৈরি হয়েছে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। এই বৈষম্যের অবসান ঘটানোই নারী লেখিকাদের উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক কালে তাঁদের কণ্ঠ আরও দৃঢ় হয়েছে।

ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে ক্ষণকালের জন্য উদিত নক্ষত্র হলেন জয়া গোয়ালা। অকালপ্রয়াতা জয়া গোয়ালার মাতৃভাষা ঠিক বাংলা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম লেখিকা। তাঁর পরিবার অর্থনৈতিক কারণে মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে চলে এসেছিল ত্রিপুরায়। আসলে দেশভাগের ফলস্বরূপ বিভিন্ন স্থানের মানুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মানুষ যারা ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার মানুষ মিশে গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এরফলে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার কথাসাহিত্যে এর সাবলীল পদচারনা পরিলক্ষিত হয়। শুধু সংস্কৃতি নয় রাজনীতি, মানবীয় সংকট, আঞ্চলিক সমস্যা, উগ্রপন্থী সমস্যা সবই উঠে এসেছে এখানকার সাহিত্যে। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন –

> "স্বভাবত ত্রিপুরার রচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনেও সেখানকার স্বতন্ত্র বাস্তবের নিজস্ব আখ্যান। বানানো গল্প খুঁজতে হয় না তাতে, গল্প তৈরি হয়েই আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কিংবা সময়ের আঁচে মানুষ মানুষীর ঝলসে যাওয়ায়। সমস্ত ধরণের উপকরণ অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে ত্রিপুরার উপন্যাসে। কেননা এখানকার সমাজ জীবনের ইতিহাস নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সত্য হলো সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে জীব বিশ্বের দ্বিরালাপ সন্ধান।"[১]

ত্রিপুরার সাহিত্যে অন্য আর একটি দিক বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে সেটি হল উপভাষার প্রয়োগ। ত্রিপুরার চা বাগানে শ্রমজীবিদের সঙ্গে লেখিকার বেড়ে ওঠা। তাঁর লেখায় তাই সর্বত্রই ওঠে এসেছে 'ছিলোমিলো' ভাষা। যা আসলে ত্রিপুরার চা বাগানের শ্রমজীবিদের বাংলা নির্ভর বিভাষা। এই ভাষা সম্পর্কে এই উপন্যাসে বলা হয়েছে –

> "এই হল আমাদের ছিলোমিলো। আমাদের মাতৃভাষা। এই ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিল ত্রিপুরার চা-বাগানে কাজ করার জন্য। ত্রিপুরার চা-বাগানে কাজ করার জন্য। শ্রমিক হয়ে। নিজেদের দেশ-গাঁয়ে প্রত্যেকেরই একটা ভাষা ছিল, যেমন আমাদের ছিল মুণ্ডারি। এখানে এসে ওরা দেখল চা-বাগানে কেউ বলছে ওড়িয়া, কেউ ভোজপুরী, হিন্দি, কেউ বা সাঁওতালী কিংবা বাংলা। একসময় দেখা গেল সব ভাষা মিলেজুলে একটা খিঁচুড়ি ভাষা তৈরী হয়ে গেছে, ছিলোমিলো। তাছাড়া বাগানগুলোর চারপাশের মানুষ, যাদের সঙ্গে হাটবাজার, হাসপাতাল, সরকারী অফিস এক আর আদালতে ছিল অন্য মিলমিশ, তাদের ভাষার প্রভাব তো ছিলই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে চালান হয়ে আসা এই মানুষগুলোই এখানে হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে যে ভাষাটি সবচেয়ে বেশী চলে, সেটা এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ছিলোমিলোই। যদিও আমাদের আসল ভাষাটা 'মুণ্ডারি'। তবু ছিলোমিলো-ই আমার মা। মায়ের বুকের দুধ।"[২]

তাঁর লেখায় এই বিভাষা ব্যবহারকারী চা শ্রমিকদের জীবন কথা বারবার উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, -

> "সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজের নিচুতলার রোদে পোড়া, ঘামে ভেজা মানুষদের আনন্দ বেদনা হাসিকান্না জীবন যন্ত্রণার বাস্তব রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি কোরা কাগজের মিহিন বুকে। ঐকান্তিক সহমর্মিতায় এবং বিশ্বস্ততায়, চেয়েছি সর্ব সমক্ষে তুলে ধরতে।"[৩]

১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মনতলা (বর্তমান নরেন্দ্রপুর) চাবাগানে জয়া গোয়ালার জন্ম। পিতা মঙ্গল গোয়ালা, মায়ের নাম বিলাসমণি গোয়ালা। কলাগাছিয়া হাইস্কুল থেকে ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করার পর মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হলেও মাঝপথেই পড়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম গল্প 'পলাশপুরের মেয়ে' সিমনা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরবার্তা'-য় প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। লেখালেখিকেই তাঁর পেশা বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গল্প সংকলন, উপন্যাস, কবিতা সংকলন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হল -

১. সনিয়া (ত্রিপুরা দর্পণ), ১৯৯৮, গল্প সংকলন।
২. পারবর্তীয়া (একলব), ১৯৯৮, নভেলেট।
৩. ছড়া জলের ছবি (সৈকত), ২০০১, গল্প সংকলন।
৪. গল্পগুচ্ছ (রাজ্য উপকরণ (কেন্দ্র), ২০০১, গল্প সংকলন।
৫. অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ (অক্ষর), ২০০৩, উপন্যাস ('দেয়াল' ও 'তবুও মাদল বাজে)।
৬. মুর্গাঝুঁটির লাল ধুল (একুশ শতক), ২০১০, উপন্যাস।
৭. বাবুসাহিবদের বলছি (ঝুমুর প্রকাশনী), ২০০৩, কবিতা সংকলন।
৮. জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব, ২০১৯

বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। ১৩ জুন ২০১৪ তাঁর অকাল মৃত্যু হয় লেখিকার।

জয়া গোয়ালার উপন্যাসগুলোর চরিত্রের দ্বারা চা শ্রমিকের বা আদিবাসীদের সমাজ চেতনা তাদের দুঃখ দুর্দশা তাদের জীবন কাহিনির সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর 'দেয়াল' উপন্যাসের রণজিৎ হোক বা 'তবুও মাদল বাজে' উপন্যাসের ডমরু, শাওনী, 'এই সীমান্তে' উপন্যাসের সম্পা, মনুর সঙ্গে নকুল সাহার মতো মহাজনের চরিত্র, 'মূর্গাঝুটির লাল ধূল' উপন্যাসের মংলা, লছমিয়া, রুকমিণী সকলেই লেখিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত অজানা এক জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্যে একটি উপন্যাস হল 'দেয়াল'। অন্তজ মানুষের হাসিকান্না জীবন জীবিকা নিয়ে লেখা তাঁর এই উপন্যাস। অন্তজ মানুষদের একজন হয়ে তিনি তাদের জীবনকথাকে তুলে ধরেছেন 'দেয়াল' উপন্যাসের রণজিৎ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। রণজিৎ কিভাবে তার মনোজগতে বিচরণ করে নিজের জীবনকে দেখেছে সে কথাই উপন্যাসের পটভূমি। চা বাগানের কর্মরত শ্রমিক দম্পতির সন্তান রণজিৎ। মা বাবা কষ্ট করে শহরে পাঠিয়েছে পড়াশোনার জন্য। শহরে থাকলেও তার শিকড় জড়িয়ে রয়েছে চা বাগিচার সঙ্গে। রণজিত তার মনোজগতে বিচরণ করে কিভাবে নিজের জীবনকে দেখেছে সে কথাই উপন্যাসের পরতে পরতে। উপন্যাসটি আত্মকথনের আদলে তৈরি।

রণজিৎ মুণ্ডা চা বাগানের ছেলে পড়তে যায় শহরে, কবিতা লেখে। তার মধ্যে যেমন রয়েছে একজন পুত্র তেমনি সে একজন স্বামী, একজন বন্ধু, একজন পিতা এবং তারসঙ্গে রয়েছে একজন 'আমি সত্ত্বা'। সেই 'আমি সত্ত্বা' জানে –

> "...মাত্র দুটি জাতের মানুষ আছে সারা সংসারে। ধনী আর গরীব। তেলেজলে যেমন মিশ খেতে পারে না, এ দু-জাতেও তেমনি মিশ খেতে পারে না।"[৪]

শ্রমিক জীবনের চিত্র লেখিকার কলমে জীবন্ত হতে দেখি। ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে মায়ের মনের ভয়কে অনুভব করতে পারি আমরা। মাকে বলতে শুনি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সাবধানে চলসি রে নুনুয়া। অরা বেজান খারাপ। তুই তো আবার থড়া করলেই গলে যাইস। মনে রাখিস, মা দিলেও অরা কিন্তুক কনদিন বাপ নাই হয়।"[৫]

এই সাধারন মায়ের সাধারন কথাই রণজিতের কাছে গাঁটের কড়ি। অন্তজ শ্রেণি থেকে উঠে এসেছে রণজিৎ। সে জানে কিভাবে মাটির সঙ্গে মিশে সে বড় হয়েছে। শহরে থেকেও নিজের জায়গাকে ভুলতে পারেনি সে। তার উক্তি –

> "এই ছোট্টটি থেকে যখন হাফপ্যান্টের বোতাম লাগাতে শিখিনি তখন থেকেই জানি আমার গায়ে একটি বিশেষ গন্ধ। ক্লাসমেটেরা বলত। সবসময়ই থাকে গন্ধটা, এখনও আছে। অরিফ্লেমের গন্ধও এখানে মার খেয়ে যায়। সে গন্ধ হল চা গাছের।"[৬]

শ্রমিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও উপন্যাসে দেখা যায়। মা বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সে আজ শহরে। তার মায়ের হাত শক্ত হয়ে গিয়েছিল চাপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে, বাবারও শরীর ঠিক ভালো নেই। সর্বহারাদের দুর্দশার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় রণজিতের কথায়। পিতার দুঃখ তাঁকে অনুভব করতে দেখি –

> "বাবা শোনান বাগানের লাভ-লোকসান বর্তমান-ভবিষ্যতের হাল-হকিকৎ। বাবা-রা ভালো নেই। যেকোনও সময় মুখ থুবড়ে পড়বে গোটা মজুর লাইন, বাগান। বাবার দুশ্চিন্তা অনিশ্চয়তা বুঝি। আবার এ-ও বুঝি বাবা সমষ্টির চিন্তায় ব্যকুল।"[৭]

মা বাবার প্রতি এই দুশ্চিন্তা এই অনিশ্চয়তাকে সে তার মনোজগত থেকে কখনও মুছে দিতে পারেনি। পিতামাতার দুঃসময়ে সবল দুটি হাত হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল সে। কিন্তু শহরিয়া রণজিত যতই মাটির সঙ্গে মিশতে যায় ততই তাকে টানে শহর। মা বাবার থেকে যেমন সে দূরে চলে আসে তেমনি সে ছোটবেলার ভালবাসা ছমিয়ার প্রেমকেও ধরে রাখতে পারেনি। সে নিজেই অনুভব করেছে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নেই। বাবার কথায় সে শহরিয়া হয়ে গেছে। তাই এখন সে লজ্জা পায় তার প্রানের ঘরে মানুষদের নিয়ে আসতে। যতই তার বন্ধু হোক না কেন সে শাশ্বতকেও তার ভাঙাচোরা হতকুচ্ছিৎ ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে আসতে চায় না। যদিও সে চায় হাত পা ছুড়ে ছোটবেলার মতো চিৎকার করে কাঁদতে, ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে। ছমিয়ার ভালোবাসাকে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই তার অনুভব হয় না। বারবার আমরা তারমধ্যে দেখতে পাই আত্মগ্লানি। সে নিজেকে যতই শহরিয়া প্রমান করতে যাক না কেন তার ভেতরের চা বাগানিয়া ছেলেটি বারবার জেগে উঠে ফিরে যায় স্মৃতির মণিকোঠায়। সে ফিরে পেতে চায় চা বাগানের গন্ধ। কিন্তু ফিরতে গিয়েও তাকে পেছন থেকে কেউ টেনে রাখে। নিজেকে খোঁজে পেতে শাশ্বত তাকে বলে –

> "নিজেকে ফিরে পেতে আয়নার সামনে গিয়ে দাড়াও।"[৮]

আসলে লেখিকা এই চা বাগানীদের একজন, তাই তাদের মর্মবেদনা তিনি অনুভব করেছেন। শহরের মানুষদের চোখে চা বাগানীয়াদের প্রতি এই অবজ্ঞা লেখিকার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। লেখিকা দিন আনা খেটে খাওয়া এই নিপীড়িত মানুষের বেদনাকে তার ছিলোমিলো ভাষার দ্বারা প্রাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। পার্বত্য ত্রিপুরার এই নিম্নবর্গীয় চা বাগানীয়াদের জীবন সম্পর্কে তার বয়ান তাঁর গভীর উপলব্ধির পরিপূরক। রণজিতের মধ্যে লেখিকা দুটি সত্ত্বাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন যেখানে সে এই শহরকেন্দ্রিক স্বার্থপর কিছু মানুষের ব্যবহারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আর তারমধ্যেই রয়েছে মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা সেই রণজিত যার অনুভব কল্পনায় অবচেতনে শুধুই ছোটবেলার চা বাগানকে ঘিরে তার স্মৃতি। মিনতিকে বিয়ে করেছিল ঠিকি কিন্তু তার স্মৃতিপটে লুকিয়ে ছিল সেই চা বাগানের ছোটবেলার ভালবাসা। যাকে সে তার অবচেতন মনে জায়গা দিয়েছিল নিজের অজান্তে। বারবার নিজের অজান্তে তার হৃদয়ে ভেসে উঠেছে ছমিয়ার ছবি। মা বাবার প্রতি অবহেলা তাকে আত্মপীড়নে দগ্ধ করেছিল। একমাত্র তার বন্ধু শাশ্বত বুঝতে পেরেছিল রণজিতের ফেলে আসা স্মৃতিকোঠাতেই তার সুখের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে। রণজিতের মনের এই টানাপোড়ন এই আত্মগ্লানি স্বজাত্যের প্রতি তার অভিমান ও তার পীড়িত জীবনযাপনের স্পষ্ট কিছু উচ্চারণ এখানে দেওয়া হল –

> ১। "চা বাগানের ছেলে কি কোনো আলাদা মানুষ? কিংবা আদৌ মানুষই নয়! অন্যদের যা আছে সবই তো আমারও আছে। গরিলা কিংবা বানর লিখলে কথা ছিল!"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- চা বাগানীদের যে শহরের একটু ভিন্ন চোখে দেখে তার প্রমাণ মেলে রণজিতের কথায়। চা বাগানী ছেলে রণজিতের লেখা পড়ে যখন আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করা হয় যে এটা কি চা-বাগানের শ্রমিকের ছেলের হাতের লেখনি, তখন রণজিতের মধ্যেকার 'আমি সত্ত্বা' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই কথা বলে।

> ২। "ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না 'নীচুতলার' ছেলেটা ওঁদের মতো লিখতে পারে কিংবা পারবে! বিশ্বাস হচ্ছিল না যতটা, মেনে নিতে পারছিলেন না তার চেয়েও বেশি। তাই বলেছিলেন—ওকে একটু দেখো ! তার মানে ও তো পারে না কিছুই, তাই একটু ঠেলেঠুলে দিও উঠিয়ে। আবার অতটুকুই উঠতে দিও, যদ্দূর উঠলে আমাদের না ছোট হতে হয়।"[১০]
>
> ৩। "চা-বাগানের ছেলে তোমাদের বিছানায় বসবে? একটা সর্বহারার ছেলে? ছিঃ কী ঘেন্না! তা কখনো হয়! যতই শার্ট-প্যান্ট পরি, আমি যে এখনও রণজিৎ মুণ্ডা-ই!"[১১] – নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিপন্ন সে।
>
> ৪। "জীবনের সত্য ও সুন্দরকে আমরাই ফুটিয়ে তুলি ছন্দে-কথায়-ছবি-ছড়ায়। দুনিয়াটাকে বদলাবার জন্য, তোমাদের মধ্যে আগুন ভরি আমরা, আগুনে আগুনে হয়ে তোমরা জ্বলে ওঠো। একসময় ফোটে আলো।"[১২]

আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার অবিরত চেষ্টার প্রমান তার এই উক্তি।

সব জায়গাতেই রণজিতের মতো চা বাগানীদের অনেকেই আক্রান্ত এবং সম্পর্কের নিবিড়তা ও দুরত্বের টানাপোড়নে ক্ষতবিক্ষত। নির্ভরতার আভাষ রয়েছে তার সত্তা বিজড়িত স্মৃতিতে, তার যাপিত জীবন কথায়। উপন্যাসে তার বয়ানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তার জীবন ইতিহাসের অভিঘাত যা বাস্তবে নতুন করে জন্ম দিয়েছে তার চেতনার।

ভিন জাতের মেয়ে মিনতিকে বিয়ে করেছে সে। তার স্ত্রী কোনভাবেই চা বাগানের শ্রমিকের পরিবারকে মেনে নিতে পারেনি। স্ত্রী মিনতির চাপে সে মুণ্ডা থেকে মণ্ডল হয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে বসে সে। মেয়েকে ইংরেজি স্কুলে পড়াতে চায় মিনতি, তাই স্বামীকে বলে পরিবারের কাছে টাকা না পাঠাতে। কিন্তু তখন রণজিতের চোখে ভেসে উঠে মায়ের জরতী দেহ বাবার উদাস দৃষ্টি, ভাইয়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখাবয়ব। কিন্তু তার স্ত্রী এসবের কিছুই গ্রাহ্য করে না। শহরের মেয়ের চাহিদা সে মেটাতে পারে না। পারিবারিক এই অশান্তির মধ্যে মেয়ে হিয়ার মধ্যে সে আশ্রয় খোঁজে। মনে পড়ে মায়ের মুখের ঘুম পাড়ানিয়া গান। এই গানের মধ্যেই সে খোঁজে শান্ততা মগ্নতা। স্ত্রীর এরূপ আচরণের পরও সে তাকে দোষারোপ করেনি। বরং নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে যে –

> "আমাদের জীবনচর্চা, জীবনচর্যা অনুভবে – কল্পনায় যার ছোঁয়া পর্যন্ত ছিল না, সপ্রতিভ ক্ষিপ্রতায় তাকে মেনে নেওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এই মিনতিকে আমি বুঝি।"[১৩]

কিন্তু ধীরে ধীরে শহর গ্রাস করতে থাকে গ্রামের সহজ সরল মানুষটিকে। শহরে বাঁচতে গিয়ে ভুলতে বসে ফেলে আসা তার জীর্ণদেহী মা তার চিন্তাক্লিষ্ট পিতাকে। মধ্যবিত্তের চাহিদার গোঙানিতে হারিয়ে যায় সে। পরিবারের অপূরিত চাহিদার প্রাপ্তির আকাঙ্খায় কাঁদে সে। সে অনুভব করে –

> "আমিই বা কম কিসে! জানো কবি আগে আমার হাঁটার রোগ ছিল। এখন সেরে গেছে। রিকশায় উঠি গাড়িতে চড়ি। ধুলোবালি, কাঁদা-কিঁচড়ে পা ডোবে না। তাই আমার লেখায় আজকাল মাটির গন্ধ নেই। সেই চোতের টিপিক-টাপাক শাওনে তনিক ভেজা-শুখা জমিনের মন-উদাসী সোঁদা সোঁদা গন্ধ নেই।"[১৪]

মুণ্ডা থেকে মণ্ডল হয়ে বাপদাদার রক্ত চিহ্নটুকু স্বপ্নলোকের তুলিকা দিয়ে মুছে ফেলে শহরজীবনের মজ্জায় ডুবে থাকা সর্বহারার ছেলেটা। রণজিত নিজেকে পরাজিত অনুভব করে। যেখানে তার সকল রণে জয়ী হবার কথা। তবে আশাবাদী মনোভাব নিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ইতি টেনেছেন –

> "আমি বাঁচতে চাই বাবা। নিজেকে যে বড় ভালবাসি আমি। ভালোবাসার জনেরাও ছড়িয়ে আছে আমার চাদ্দিকে। বাঁচতে আমার আমার হবেই। - আচ্ছা বাবা, গামলার ঐ কুরঙা আঠার মতো ঘিনঘিনে রঙটা ধোয়া যায় না? দেখো না, অনেকদিন পর আজ যেন দিন-দিন মনে হচ্ছে চৌদ্দিকটা। ...আমি চাই আমার গায়ে আবার সেই গন্ধটা ফিরে আসুক।"[১৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 270 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এইভাবে মননশক্তির উপর আস্থা রেখে সে নতুন করে নিজেকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। স্মৃতি বিজড়িত ছোটবেলার মানসিকতা এবং শহরকেন্দ্রিক মননের বিশ্লেষণে রণজিত বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিপরীত দুই মেরুর মিলনের আখ্যান তৈরি করে। তারপর এই অবস্থানের মাঝামাঝি একটি পরিসর তৈরি করে।

ঔপন্যাসিক জয়া গোয়ালা সমাজবাস্তবতার মানসিকতাকে বাংলা সাহিত্যের আখ্যানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসে লেখিকা রণজিতের মনোজগতে প্রবেশ করতে বেছে নিয়েছেন তার মাতৃভাষা ছিলোমিলোকে। এই ভাষা যেন উপন্যাসকে প্রাণ দিয়েছে। রণজিতের মাধ্যমে আমরাও চলে গেছি সুদূর চা বাগিচায়। আমরাও যেন গন্ধে মেতেছি চা পাতার। তাই একথা বলতেই হয় যে ভাষার মাধ্যমে লেখিকার এই উপন্যাসের বয়ান আমাদের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। আমরাও মিশে গেছি তাদের সংস্কৃতি তাদের ঐতিহ্য তাদের ভাষার মধ্যে। এই আত্মীকরণ আমাদের মধ্যে প্রভুত মেলবন্ধন তৈরি করেছে। চা বাগানের মানুষদের সমস্যাবহুল জীবন, তাদের পীড়ন তাদের সংস্কার-সংস্কৃতির বাস্তব দলিল তার এই উপন্যাস। বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জীবন কীভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার বাস্তবরূপ ফুটে উঠে এই উপন্যাসে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস’, ‘শতাব্দীর ত্রিপুরা’, নির্মল দাস, রমাপদ দত্ত (সম্পা.), অক্ষর পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৫, পৃ. ২৪৩
২. চৌধুরী, কথাকলি, (প্রকাশক) জয়া গোয়ালা রচনা সমগ্র, মুখাবয়ব প্রকাশন বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৯, পৃ. ২৩৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪